মার্চ থেকে মে

আষিক খুদাবখ্‌শ
লেখক কবি ও বিজ্ঞানী, কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটি,
পিটসবার্গ, যুক্তরাষ্ট্র

মার্চ

‘নো হ্যান্ডশেক পলিসি’

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে, বোস্টনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ক্লাবের হলঘরে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করি এরকম ষাটজন বিজ্ঞানী বসে আছি, আড়ষ্টভাবে মৌখিক কুশল বিনিময় করছি। গতকালই একটা ইমেইল এসেছে— করমর্দন করা যাবে না।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি, বোস্টনের বায়োজেন সংস্থা আয়োজিত বার্ষিক সভায়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্বাস্থ্যসেবায় নিযুক্ত বিজ্ঞানীরা যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন

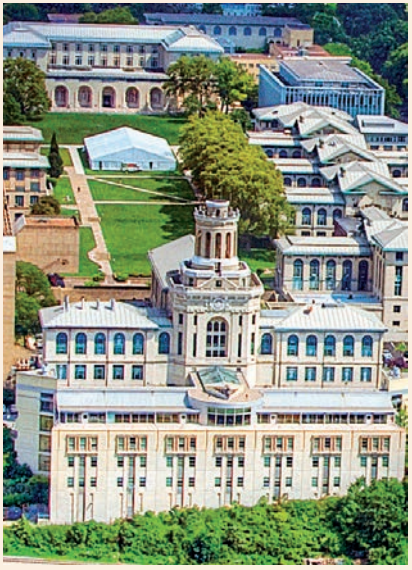

করোনা-আক্রান্ত ইউরোপিয়ান বিজ্ঞানী। শুরুতে, কারোরই কোনো উপসর্গ ছিল না।

আপাত-সুস্থ মানুষদের থেকে সংক্রমণ— যে-কারণে সারা বিশ্বে এত দ্রুত ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে।

সেই হাতেগোনা বিজ্ঞানীদের হাত ধরে ভাইরাস পৌঁছে যায় বায়োজেনের বহুসংখ্যক কর্মচারীর পরিবারে। আর তারপর সেইসব কর্মচারীদের পরিবারের সূত্রে, ভাইরাস পৌঁছয় ছ-টি মার্কিন প্রদেশে। এই বায়োজেন কনফারেন্স আমেরিকায় করোনাভাইরাস, যার ভালো নাম সার্স-কোভ-২ আর সংক্রামিত ব্যাধিটির নাম কোভিদ-১৯, সেই কোভিদ-১৯-এর প্রথম কয়েকটি সুপার-স্প্রেডিং ইভেন্টের একটি।

সুপার-স্প্রেডিং ইভেন্ট— অর্থাৎ কিনা এমন একটি ঘটনা, যার দৌলতে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে (ভৌগোলিক ব্যবধানে থাকা) অনেক সংখ্যক মানুষের শরীরে।

রোগের প্রাথমিক প্রকোপের আঁচ পাওয়া মাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ইমেইলে জানান এই ‘নো হ্যান্ডশেক পলিসি’-র কথা। দু-দিন ব্যাপী কনফারেন্স, অসংখ্য বিজ্ঞানচিন্তার আদানপ্রদানের মাঝে, সবাই সাধ্যমতো সজাগ ছিলাম। ঘন ঘন হাত ধোওয়া, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, এই সবের মধ্যেই চলেছিল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে দেওয়ার তুমুল আড্ডা-আলোচনা। তাই হার্ভার্ডের সেই কনফারেন্স বোস্টনের দ্বিতীয় সুপার-স্প্রেডিং ইভেন্ট হয়ে ওঠেনি।

কনফারেন্সের শেষে, **এরপর ৪ পাতায়**

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা, কফিশপে বসে একটা উপন্যাসের পাতা ওল্টাচ্ছি— হঠাৎ খেয়াল হল, সমস্ত লোকের চোখ একযোগে টিভির পর্দায়— ‘অ্যালিগেনি কাউন্টিতে প্রথম করোনা পজিটিভ কেস’।

উইকেন্ড কাটানোর পরিকল্পনা ছিল বোস্টনেই এই গবেষক-বন্ধুর বাড়ি। সেই সপ্তাহান্তিক ছুটি আর

বেড়ানোর আমেজে টুকরো-টাকরা চিন্তার খবর ভেসে আসছিল। স্প্রিং ব্রেকের ছুটির পর হার্ভার্ড নাকি সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাসে ফেরত আসতে বারণ করে দিয়েছে। বাকি সেমেস্টারে চলবে অনলাইন পড়াশোনা। পিটসবার্গে তখনও রেস্টুরেন্ট, সিনেমা হল, জিম— সবকিছুই রমরমিয়ে খোলা। অ্যালিগেনি কাউন্টিতে (পিটসবার্গ এই কাউন্টির অন্তর্ভুক্ত) তখনও ধরা পড়েনি একটিও সংক্রমণ। আর পড়বেই-বা কী করে, তখনও তো ব্যাপকহারে রোগপরীক্ষার কোনো পরিকাঠামোই তৈরি হয়নি।

ফিরে আসার পর বৃহস্পতিবারের কথা— পিয়ানোর অধ্যাপকের সঙ্গে সাঁতার কাটছি, পুল বন্ধ হয়ে যেতে পারে শুনে উনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, এখনও তো একটা কেসও অ্যালিগেনি কাউন্টিতে ধরা পড়েনি। আমাদের এখানে ওসব কিছু হবে না। সামনে অনেকগুলো কনসার্ট— এইসব অপয়া চিন্তাভাবনা মাথা থেকে উড়িয়ে দাও। সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা, কফিশপে বসে একটা উপন্যাসের পাতা ওল্টাচ্ছি— হঠাৎ খেয়াল হল, সমস্ত লোকের চোখ একযোগে টিভির পর্দায়— ‘অ্যালিগেনি কাউন্টিতে প্রথম করোনা পজিটিভ কেস’। কয়েক মিনিটের মধ্যে ফোনে ভেসে উঠল নোটিফিকেশন— অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইউনিভার্সিটির সুইমিং পুল।

গত তিন বছর একদিনও সাঁতার মিস করিনি। ফিটনেস ক্লাবের পুল তখনও খোলা। অভ্যেসের বসেই শুক্রবার ফিটনেস ক্লাবের পুলেই সাঁতার কেটেছিলাম। জিমের সরঞ্জাম, লকার-রুমের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দেখভাল করে মার্টিন। কাচের দেওয়ালে নিবিষ্ট মনে ডিসিনফেক্ট্যান্ট লাগিয়ে ঝাড়পোঁছ করছিল। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কাজ কি বাড়ল নাকি তোমার?’

মার্টিন জানাল, আগের থেকে কাজ সামান্য বেড়েছে, তবে তার থেকে হাজার গুণে বেড়েছে অনিশ্চয়তা। জিম হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে, চাকরি থাকবে না। আর এই বাজারে নতুন চাকরি খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না। তারপর হঠাৎ হেসে বলল, ‘জিম বন্ধ হলে চাকরি থাকবে না, কিন্তু চাকরি থাকলে প্রাণ থাকবে কিনা সেটা বুঝতে পারছি না।’

মার্টিনের দুশ্চিন্তা, আর সেইসঙ্গে নিউ ইয়র্ক ইতালিতে যেরকম ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে ভাইরাস, ঘণ্টায় ঘণ্টায় আসছে নতুন নতুন দুঃসংবাদ, তাতে মন কিছুটা দ্বিধান্বিত। নিউ ইয়র্ক, যেখানে কিনা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আয়োজিত হয়েছিল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বিরাট কনফারেন্স, অসংখ্য বন্ধুবান্ধব সমেত হুল্লোড় করে কাটিয়েছি একটা গোটা সপ্তাহ— মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে সেই শহরে এখন প্রতিদিন শয়ে শয়ে লোক মারা যাচ্ছে। পিটসবার্গ কি সেইরকম মড়কের থেকে মাত্র কয়েক সপ্তাহ দূরে? স্বাস্থ্যসচেতনতার জন্য সাঁতার, জিম, এতসব সাতকাণ্ড রামায়ণ— সেই স্বাস্থ্যরক্ষার তাগিদেই বিপদ বাধাচ্ছি না তো? পঞ্চাশ মিটার ডুবসাঁতার কাটতে পারি, ফুসফুস বেশ পোক্ত— এই বলে বড়াই করছিলাম এক ডাক্তার বন্ধুর কাছে। তিনি মিটিমিটি হেসে বলেছিলেন— তা বেশ তো, ভাইরাসের সংক্রমণে ফুসফুস কাজ করা বন্ধ করে দিলে, তুমি বাড়তি আস্ত এক মিনিট বেশি বেঁচে থাকবে, এটাই-বা কম কী! ম্যারাথন রানারদেরও নাকি কুপোকাত করে দিয়েছে কোভিদ-১৯। যাব কী যাব না ভাবছি, জন ফোন করে লোভ দেখাল— ‘পনেরো মিনিট সাঁতার কাটব, সঙ্গে ট্রাক নিয়ে আসছি। তারপর বাজারে নিয়ে যাব তোমাকে। যা হাল বুঝছি— ভালোমতন খাবার-দাবার মজুত না করলে, দারুণ অসুবিধায় পড়বে।’

স্থানীয় একটা সফটওয়্যার কোম্পানিতে কাজ করে জন। কিন্তু গেরস্থালির টুকিটাকি মেরামতি থেকে শুরু করে, বাথরুম রিমডেলিং, জানলা রং করা, নানারকমের হুড়ুমদুড়ুম কাজ তার ভারী পছন্দের। একটা শৌখিন গাড়ি থাকলেও, বাইশ বছরের সঙ্গী ম্যাটাডোরকে এখনও বিদায় জানাতে পারেনি।

সাঁতারের শেষে দোকানের সামনে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বলল— ‘এক ট্রাক জায়গা রয়েছে, পুরো দোকানটাই যদি কিনে নিতে চাও, ট্রাকে তার অনেকটাই ধরে যাবে।’

মে

জনের সঙ্গে ট্রাকবোঝাই খাবার-দাবার কিনে আনার পর কেটে গিয়েছে আস্ত দুটো মাস। ট্রাকে জায়গা থাকলেও, ফ্রিজে জায়গার সংকুলান হবে না বলে যতটুকু পারা যায় ততটুকুই ছিল যুদ্ধকালীন সঞ্চয়। ফিটনেস ক্লাবের পুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পরের দিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায়, আগামী সপ্তাহে ইউনিভার্সিটি সমস্ত বিল্ডিং সিল করে দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। সমস্ত ক্লাস অনলাইন, বাজার করা ছাড়া বাইরে বেরোনো যাবে না। বিরাট শপিং স্টোরে একই সময়ে দশজনের বেশি লোক থাকতে পারবে না, রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার কেবল অনলাইন অর্ডার করা যাবে উবার-ইটস মারফত— এই সব বিধিনিষেধের ঘেরাটোপে কেটে গেছে আট-আটটা সপ্তাহ।

সংক্রামক ব্যাধির স্ট্যাটিসটিকাল মডেলিং করেন গবেষক রোনি রোজেনফেল্ড। রোনিকে অন্য একটা কাজে ইমেইল করেছিলাম। তিনি জানিয়েছিলেন, কোভিদ-১৯-এর গতিবিধি আন্দাজ করতে এতটাই নাওয়া-খাওয়া ভুলেছেন যে, অন্য কোনও দিকে হুঁশ দেওয়ার সময় নেই। পিটসবার্গের মেয়রের দূরদর্শিতা, হাসপাতালে আপৎকালীন ভেন্টিলেটরের ব্যবস্থা, রোনি রোজেনফেল্ডের দৃষ্টান্তমূলক নেতৃত্বে কোভিদ-১৯-এর গতিবিধির প্রায়-নিখুঁত পূর্বাভাস, আর একটি আস্ত শহরের সমস্ত মানুষের সহযোগিতায় বারো লক্ষ জনসংখ্যার অ্যালিগেনি কাউন্টিতে মৃতের সংখ্যা এখন অব্দি ১৪১। ঠিক এই মুহূর্তে ভেন্টিলেটরে রয়েছেন ৬৭ জন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভাঁড়ারেও তেমন টান পড়েনি। তাই লকডাউনের দরুণ আর যা সব অসুবিধা হতে পারে, সেই সবে কোনো তারতম্য না থাকলেও, সার্বিক ডিসিপ্লিনের জোরে দুর্যোগের সিংহভাগ কাটাতে পেরেছে আমার শহর।

লেখা শেষ করছি যখন, ততক্ষণে রেড জোন থেকে ইয়েলো জোনে সন্তর্পণে পা রাখছি আমরা...